উত্তর আধুনিকতা ও মৌল মানবতন্ত্র

স্বরাজ সেনগুপ্ত

'আধুনিকতা'র যে ঐতিহ্যকে আমরা প্রায় এক-দেড়শ' বছর ধরে জেনে ও মেনে এসেছি, একুশ শতকের দুয়ারে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতি ও সভ্যতার, সমাজ ও সাহিত্যের প্রগতিকে বুঝতে অন্য কোনো পরিভাষার সৃষ্টির কি প্রয়োজন আছে? বলতে চাই 'উত্তর আধুনিকতা' বলে যে বিচার-বিতর্ক আজ শোনা যায়, তার নতুনত্ব কতটুকু? আমাদের জীবন, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও শিল্পভাবনায় নবতর এমন কিছু উদ্ভূত, উন্মীলিত ও বিস্ফারিত হয়েছে কিনা যার' জন্যে 'উত্তর আধুনিকতা'র মতো চমকানো শব্দ বা পরিভাষা দরকার? 'উত্তর আধুনিকতা' শুধু যে একটা শব্দ? কথার কথা? কেবল বুদ্ধিবৃত্তির উদ্দীপক? এর ভেতরে কি কোনো সারবস্তু নেই? নাকি 'আধুনিকতা' কথাটি দিয়েই উত্তর-আধুনিকতার নতুন ভাষ্য বা ব্যাখ্যাগুলো (আদৌ যদি নতুন হয়) বোঝা সম্ভবপর? বিগত শতকের বিশ-তিরিশ-চল্লিশের দশকগুলোতে পাউন্ড-এলিঅট অনুসরণে এ-দেশে শিল্প-সাহিত্যে এবং ডারউইন-ফ্রয়েড-মার্কস-এর প্রভাবে জীবন-চেতনায় ও সমাজ-ভাবনায় যে চূড়ান্ত আধুনিকতা (হাই মর্ডানিজম্) বোধিভুবনকে আলোড়িত করেছিল, তাই বাইরে কি এমন নতুন ভাষ্য প্রস্তাবিত হয়েছে উত্তর আধুনিকতায়? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার।

যাকে ইতিহাস বলি, তা একই সঙ্গে ধারাবাহিক ও ধারাবিচ্ছিন্ন। ইতিহাস একদিকে অতীতের কথা, অন্যদিকে বহু মুহূর্ত-দিন-মাস-বছর-যুগ ও শতকের সমষ্টি। যাকে ঐতিহ্য বলে মানি সেও অস্থির, আবর্তময়, বিবর্তিত। সময়ে সময়ে ঐতিহ্যেরও আকার-প্রকার বদলে যায়। তবে বহুদিন ধরে আমাদের মনোবিশ্বে পশ্চিমের ডারউইন, মার্কস, ফ্রয়েড, আইনস্টাইন, এলিঅট, রালে, কামু, সার্ত্রে এবং এ দেশের গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্রনাথের কমবেশি উপস্থিতি এক ধরণের স্থির ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য আমাদের দিয়েছে। আমাদের জীবনদৃষ্টি ও ভাবনাচিন্তার দীর্ঘদিনের নিয়ন্তা এঁরা সবাই। যদিও তাঁদের বক্তব্য বারবার পুনর্মূল্যায়িত হয়েছে, হচ্ছে, কিন্তু কখনো সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়নি। উত্তর আধুনিকতাকেও আমরা কোনো পুনর্মূল্যায়ন, অথবা বিশেষ কিছু বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নতুন দৃষ্টিপাত মনে করতে পারি।

উত্তর আধুনিকতার একজন প্রধান ভাষ্যকার মাতেই ক্যালিনেসকু প্রথম দিকে তাঁর একটি নিবন্ধে পোস্টমডার্নকে নতুন বিন্যাস ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার (শুধু সাহিত্যে শিল্পে) অর্থাৎ 'আভাঁগার্দ'-এর সঙ্গে মেলাতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে প্রাক্তন মত পরিত্যাগ করে এগুলোর পার্থক্য তিনি তুলে ধরেন এবং পোস্টমডার্নকে জীবন ও সমাজ ভাবনার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। আর এক ভাষ্যকার মিকো যাবোসি 'মডার্ন' ও 'আভাগার্দ'-কে এক করে দেখেন আর 'পোস্টমর্ডানিজম্'-এর নাম দেন 'নিও আভাঁগার্দ'। পাউল দ্য মানের কাছে 'মডার্ন' এক উদ্ভাবনাময় অনুষঙ্গ; 'মডার্ন' তাঁর ব্যাখ্যায় যে কোনো সময়ের সমাজে ও সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে ও সভ্যতায় একটি বোধসম্ভব সংকট মুহূর্তের অন্তর্দৃষ্টি-উৎসারিত উপলব্ধি এবং 'পোস্টমডার্ন' এই উপলব্ধির সুদূর প্রসারণ। উইলিয়ম স্পানোস উত্তর আধুনিকতা বলতে বোঝেন কোনো ধারাপারম্পর্য নয়, অর্থাৎ 'মডার্ন' থেকে 'পোস্টমর্ডানে' উত্তরণ নয়, বরং মানবিক অঙ্গীকারের একটি স্থায়ী মেজাজ, যা স্বতন্ত্র। জন বার্তের অভিমত : 'উত্তর আধুনিকতা' এমন একটি জীবন পর্যালোচনার নাম যা আজও সম্পন্ন হতে পারে নি এবং যাকে আমরা উত্তর আধুনিকতা বলে ধারণা করি তা আসলে অবিরাম জিজ্ঞাসা ও সন্ধিৎসা।

'উত্তর আধুনিকতা' নামের উৎস অনিশ্চিত, অস্পষ্ট। আমরা এইটুকু জানি, ফ্রেদেরিকো ওনিস ১৯৩৪-এ মাদ্রিদে প্রকাশিত তাঁর কবিতা-সংকলন-গ্রন্থে এ নাম প্রথম ব্যবহার করেন। ১৯৪২-এ প্রকাশিত, ডাড্‌লি-সম্পাদিত 'সমকালীন লাতিন আমেরিকার কবিতা' সংগ্রহে শব্দটির পুনর্ব্যবহার মেলে। বিশ শতকের প্রথমদিকে সম্পাদিত সূত্রে উত্তর আধুনিকতার উল্লেখ আছে। আধুনিকতার সীমাবদ্ধতার প্রতি মৃদু এক প্রতিক্রিয়ার সূত্রে উত্তর আধুনিকতার উল্লেখ আছে। টয়েনবী অবশ্য পশ্চিমী সভ্যতার নবপর্ব নির্দেশের জন্যে শব্দটি প্রয়োগ করেন। পঞ্চাশের দশকে চার্লস ওলসন এবং এ দেশে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রায়ই উত্তর আধুনিকতার কথা বলতেন।

১৯৫৯ ও ১৯৬০-এ আরভিঙ হো এবং হ্যারি লেভিন উত্তর আধুনিকতার কথা কিছুটা আলাদাভাবে বলতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, উত্তর আধুনিকতা এক অবতরণ — ঠিক এই মুহূর্তটির কাছে। অতি পরিচিত আধুনিকতার আত্মীয়তাকে অস্বীকার করার নাম উত্তর আধুনিকতা। ইহাব হাসান ও লেসলি ফিল্ডার একটু অপরিণত ভঙ্গিতে ষাটের দশকে 'উত্তর আধুনিকতা' শব্দটি ব্যবহার করেন। যাকে আধুনিকতার অভিজাত ঐতিহ্য বলে জানি ফিল্ডার সেই আধুনিকতাকে অনেকটা চ্যালেঞ্জ করলেন। ইহাব হাসানের ভাষ্যে উত্তর আধুনিকতা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধারাক্রমের একটি পরিণাম মাত্র।

জানি, নানা কথার জালের আড়ালে উত্তর আধুনিকতা বিষয়টিকে স্পষ্টমূর্তিতে দেখা গেল না। বোধগম্যতার সীমায় একে ছুঁতে গেলে একটু বড়ো বৃত্তান্তে আমাদের যেতে হবে, দু'একটা বাক্যে তার সবটা পরিচ্ছন্ন হবে না।

উত্তর আধুনিকতা সাহিত্যে শিল্পে তো বটেই, বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার জগতেও একটা তোলপাড় করা প্রসঙ্গ। আমরা জানি নতুন কোনো পরিভাষা দেখা দিলেই তা নিয়ে হৈ চৈ হয়; এক সময়ে 'র‍্যাডিক্যাল', 'সুররিয়াল' প্রভৃতি পরিভাষা নিয়েও কম হৈ চৈ হয় নি। এ দেশে না হলেও পশ্চিমে এটা বেশি করে সত্য। সে দিক থেকে পরিভাষা-অন্তরিত প্রতিপাদ্য কতটুকু তা নিয়ে কখনো কখনো সংশয় দেখা দেয়।

কিন্তু উত্তর আধুনিকতা সেই জাতের নয় (যেমন ছিল না 'র‍্যাডিক্যাল' বা 'সুররিয়াল' পরিভাষা দুটোও)। এ নিয়ে বিতর্ক আছে অনেক কিন্তু অন্তঃসারশূণ্যতার লেবেলে একে খারিজ করা অসম্ভব। অভিনবত্ব বিষয়ে চমৎকার একটি মন্তব্য আছে উইলিয়াম জেমসের। জেমসের কথায় — নতুনত্ব প্রথমে 'ননসেন্স', তারপর তাকে বুঝতে চেষ্টা করা হয়; বোঝা গেলে তাকে মানা হয়, যদি তার মধ্যে সত্য নিহিত থাকে। পরিশেষে তাকে জীবনচর্যায়, সাহিত্য ও সমাজ বিশ্লেষণে, ভবিষ্যতের আদর্শ প্রভাবনে প্রয়োগও করা হয়। উত্তর আধুনিকতাকে আধুনিকতার প্রতিবাদী মনে করে বিবাদ বাধিয়েছেন অনেকে, তাঁরা একে নতুন বলেও স্বীকৃতি দিতে চান নি। তথাপি, তাঁদের বিবাদ ও অবজ্ঞাকে উপেক্ষা করে কেবল সাহিত্যে শিল্পে নয়, মানুষ ও মানুষের সমাজকে নিয়ে ভাবনাচিন্তার অন্যান্য এলাকাতেও উত্তর আধুনিকতার দুরন্ত প্রবেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

শব্দটি হল 'উত্তর আধুনিকতা'। কিন্তু 'উত্তর' কেন? এক সময়ে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতি দর্শনের আলোচনায় 'বিয়ন্ড' (beyond) কথাটি বেশ ব্যবহৃত হত (লিওনেল ট্রিলিঙের 'বিয়ন্ড কালচার' অথবা মানবেন্দ্রনাথ এবং ফিলিপ স্প্র্যাটের 'বিয়ন্ড কম্যুনিজম্' প্রভৃতি নাম মনে পড়বে)। এখন তো 'পোস্ট' শব্দটি প্রায়শ উচ্চারিত হয়। যেমন কেনেথ বাওল্ডিং-এর প্রিয় শব্দবন্ধ 'পোস্টসিভিলাইজেশন', জর্জ স্টাইনারের প্রিয় ভাবনা 'ডেফিনিশন অব পোস্টকালচার'; আর এঁদের সবার আগে রডরিক সেইডেনবার্গ প্রকাশ করেছিলেন 'পোস্টহিস্টোরিক্যাল ম্যান'।

দুই

'আধুনিকতা' একটা জীবনদৃষ্টি, একটা মনোভঙ্গি, একটা মেজাজ এবং আন্দোলন — পৃথিবীতে প্রায় দেড় শতক নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় ছিল। এই আধুনিকতা দ্বারা প্রাচীন সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো আক্রান্ত ছিল দীর্ঘকাল। আধুনিক স্বেচ্ছালিপ্ত সামর্থ্য, এক স্বেচ্ছাব্রতী উদ্যম। এ এমন একটা সংবেদনা যা আলোর মুখে নিক্ষেপ করে অগ্রসর চেতনাকে।

আমরা আধুনিকতাকে সাধারণভাবে দেখি প্রাক্তন জীবনচর্চা ও জীবনচর্যার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ হিসেবে, সনাতনী কর্তৃত্বের প্রতিপক্ষে আধুনিকতা এক সপ্রতিভ দ্রোহ। এক শতককাল জুড়ে সমাজবিজ্ঞানীরা আধুনিকতা বিষয়ে ভেবেছেন, যেমন মার্কস, যেমন ফ্রয়েড, যেমন মানবেন্দ্রনাথ ও প্যারেটো, যেমন হেবার, রাসেল, ফ্রম এবং আরও অনেকে। মার্কসের বিশ্বাস, 'দ্বান্দ্বিক' বস্তুবাদ এবং আর্থনীতিক 'অদৃষ্টবাদ'ই চূড়ান্ত আধুনিকতা। ফ্রয়েডের অভিমত, অহমের আঁটোসাঁটো বন্ধনের অবতলে প্রবৃত্তিচালিত অন্তহীন অবচেতন আছে — একে উন্মোচন করাই আধুনিকতা। প্যারেটোর কথা, যুক্তিরূপের অভ্যন্তরে আবেগ আর ভাবালুতাও কম নেই — আধুনিকতার লক্ষণ হল যুক্তি ও ভাবাবেগের সন্ধি। মানবেন্দ্রনাথ বলতে চাইলেন, নীতিনিষ্ঠ যুক্তি-প্রবণতা এবং সার্বিক স্বাধীনতার জন্য তীব্র রোমান্টিক অভিলাষই বিশ শতকের জীবনচর্যার আধুনিকতা।

আধুনিকতা বরাবরই জোর দেয় অন্ধ অভ্যাস ও আনুগত্যের অর্থরাহিত্যে। এক্ষেত্রে আধুনিকতা মানবসত্তার মহিমা ও তার অফুরন্ত সৃষ্টিশীলতায় অঙ্গীকারবদ্ধ — কোনো কর্তৃত্ব ও 'অদৃষ্ট'কেই সে মানে না। আবার আধুনিক মানুষের গভীরতম স্বভাব হল — নিজেই নিজের ঊর্ধ্বে ওঠা, না-বাচক শূন্য মাঠ দেখেও, মৃত্যুর কথা জেনেও, নশ্বরতা ও সসীমতা মেনেও। আধুনিক মানুষ মৃত্যুকে জানে, কিন্তু মানে না। সসীম জীবন তার চেনা, তবু তাকে সে স্বীকার করে না। আধুনিক মানুষ ধাবমান এক অসীমতার দিকে। এটাই তার ব্যাধি, এটাই তার স্বাস্থ্য। সীমা স্বীকার করতে তার দ্বিধা, অথচ সীমা লঙ্ঘন তার পক্ষে দুঃসাধ্য। সে ছাড়িয়ে যেতে চায় প্রাচীন জীর্ণ পৃথিবীকে, সে ছিঁড়ে ফেলতে চায় কর্তার ও কারকত্বের বাঁধন, তার এক পা বর্তমানে, আর এক পা ভবিষ্যতে। আঠারো শতকের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিবাদের উদ্ভব আধুনিক মানুষের মধ্যে সম্ভবনার একটু নতুন অভিজ্ঞতা জাগায়। ইতিহাসের প্রথম

আধুনিক ফাউস্টের মতো মানুষ ঈশ্বরোপম জ্ঞান অর্জন করে, মানুষের ভিতরেই খুঁজে বার করা গেল ঈশ্বরের আনুরূপ্য। যা ছিল কল্পনা, আধুনিক মানুষের জীবনে তা বাস্তব হল। আধুনিক মানুষের মতো আধুনিক সমাজেও প্রত্যয় প্রত্যাশার রূপ গেল আমূল বদলে। আর্থ-ব্যবস্থার রূপান্তর, দাসবিরোধী মানসতা, নারীর অধিকার, শিশু-শ্রম ও নির্মম শাস্তি বিধানের সমাপ্তি, সবার জন্য শিক্ষা — এসবই হল আধুনিক সমাজের নতুন প্রত্যয় ও প্রত্যাশা। সবচেয়ে বড়ো কথা স্বাধিকার স্বাধীনতাই সুখ — এই ধরণের ইতিবাদে আধুনিকতার স্থির অঙ্গীকার।

তিন

উত্তর আধুনিকতা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে ফ্রান্সে দেখা দিলেন মিশেল ফুকো, জার্মানিতে য়ুর্গেন হেবারমাস। কিন্তু এঁরা দু'জন দাঁড়িয়ে আছে দুই বিপরীত মেরুতে। *পাগলামি ও সভ্যতার*-র লেখক ফুকো সভ্যতার শরীর থেকে ধুয়ে মুছে দিতে চান অষ্টাদশ শতক ও এনলাইটমেন্ট বাহিত আধুনিকতার সকল রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ। অন্যপক্ষে হেবারমাস আলোকপর্বীয় আধুনিকতার সমর্থক। এই আধুনিকতা তাঁর দৃষ্টিতে ধারাবাহিক এবং এর গতিমুখ সম্পূর্ণতার দিকেই। পাগলামির ইতিহাস রচয়িতা ফুকোর উল্টো উত্তর আধুনিক জীবন-দর্শন অথবা হেবারমাসের যুক্তিযুক্ত ও সত্যসন্ধ উত্তর আধুনিক ভাবনাচিন্তা বিচার-বিশ্লেষণের আগে আধুনিকতা বিষয়ে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অবধারণ বোধকরি জরুরি।

সাধারণভাবে আমরা বুঝি, আধুনিক মানব সত্তার মহিমা ও তার অফুরন্ত সৃষ্টিশীলতায় অঙ্গীকারবদ্ধ। আধুনিকতায় প্রগাঢ় হয়েছে আত্মচেতনার সঙ্কট। একদিকে ধর্মে ও ঈশ্বরে আস্থাহীনতা, তুরীয় মোক্ষে অবিশ্বাস, স্বর্গ-নরকে অনির্ভরতা, যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণে ও বিজ্ঞানে সংশক্তি; অন্যদিকে একই সঙ্গে আবার জীবনের অর্থহীন ও গন্তব্যহীন, বিমূঢ়, নিরুত্তর শোভাযাত্রা দেখে সংবেদী ব্যক্তির ভেতরেও জমাটবদ্ধ প্রকাণ্ড শূন্যতার বোধ। আধুনিক জীবনধারায় এই শূন্যতা দেখে যাঁরা দিশেহারা হয়ে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পান নি — জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, দর্শনে-সাহিত্যে, মহৎ কোনো জীবনাদর্শে আলোর উৎস দেখেন নি -- তাঁরা সংবেদী অথবা মেধাবী হয়েও কোনো-না কোনো অন্ধকারে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত হয়েছেন। ফুকোও তাঁর আধুনিকতার ধ্যান-ধারণায় 'পাগলামি'র অন্ধকারে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব সময় পর্যন্ত মোটামুটি একটা সুশৃঙ্খল পৃথিবী আমরা পেয়েছি। এই সময়সীমার মধ্যে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধারণায় শূন্যতাবোধের এমন সঙ্কট, এমন বিমূঢ় দিশেহারা অসহায়তা দেখা দেয় নি। জীবনবোধে, সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য চেতনায় যে-আধুনিকতার জন্ম হয়েছিল তার মধ্যে অস্থিরতা ও বিমূঢ়তা ছিল না। টয়েনবী প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা আধুনিকতার এই অধ্যায়টিকে 'ক্ল্যাসিক্যাল' বলে চিহ্নিত করেছেন। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, জীবন-জিজ্ঞাসা, সমাজ-ভাবনা প্রভৃতির মধ্যে বিরোধ থাকলেও, পরস্পরের প্রতি সহনশীল মান্যতাও ছিল। সভ্যতার কোথায়ও না কোথায়ও একটা বিশ্বাসের ভূমিকা ছিল, তার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংশয়ের সঙ্কট এমন জটিল ছিল না।

চার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এই বিশ্বাসের ভূমি ধসে পড়তে থাকে। শিল্প-সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক ভাবনায়, নান্দনিক চেতনায় একটা আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দেয়। কিন্তু কী সেই পরিবর্তন? 'ক্ল্যাসিক্যাল' আধুনিকতার সঙ্গে এই পরিবর্তিত আধুনিকতার পার্থক্যই বা কতটা? লৌকিক মানবীয় বোধে তেমন ওলট পালট হয় নি; বন্ধুত্ব, প্রণয়, অনুরাগ, রিরংসা, ভালোবাসা সবকিছু এক রকমই ছিল। কিন্তু গতি, সচলতা ও ধাবমানতায় পরিবর্তন আসে। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর নতুন নতুন সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী অস্ত্র ও যন্ত্রের উদ্ভাবনে পরিবর্তমান ভূ-দৃশ্য মানুষের চেতনায় নতুন আধুনিকতা তৈরি করবেই, করলও। আলোড়ন, গতি ও পরিবর্তনে সাড়া দিয়ে পুরোনো বিশ্বাসে ভাঙন এবং জীবন চর্চা ও চর্যার নতুন ব্যাকরণ রচিত না হয়ে পারল না। এসবের মধ্য দিয়ে আর এক আধুনিকতার জন্ম হল। যে নিশ্চল শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ নিয়তি হয়ে উঠেছিল ভাবুকের, স্রষ্টার, তার ভূমিকা শেষ হল। আলোড়ন ও গতি সম্পর্কে এই নতুন উপলব্ধি, বিজ্ঞান-মনস্কতা, বিশ্ববীক্ষণ এমন একটা প্রকরণ রচনা করল যার ফলে মানুষ এবার নিজের বোধ ও অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও চেতনা, সৃষ্টি ও উদ্ভাবন বিচার করার সুযোগ পেল। সেই সঙ্গে জীবনের পুরোনো শৃঙ্খলা ও স্থিতি ভেঙে পড়ায় এই পরিবর্তন সূক্ষ্মভাবে কোনো কোনো বুদ্ধিমান, ধীমান ভাবুকেরও চেতনায় শূন্যতা-ভীতির সঙ্কট নিয়ে এল। শুধু তাই নয়, এঁরা দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের রক্তপাত ও মৃত্যুই দেখলেন, দেখলেন ধ্বংসস্তূপ, দেখলেন সভ্যতার শরীরে দুরারোগ্য এক একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। এঁরা মানুষ ও মনুষ্যত্বের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন এবং আধুনিকতাকে পর্যালোচনা করলেন উদ্বেলিত উন্মাদনায়, যুক্তি-বুদ্ধি ও বিজ্ঞান-চেতনা দিয়ে কালের সঙ্কট থেকে উত্তরণের পথ না খুঁজে অন্ধকার খুঁড়ে খুঁড়ে আদি পুরুষের অস্থি করোটি হাতে নিয়ে 'তন্ত্রসিদ্ধ' হতে চাইলেন অথবা পাগলামির নিষ্প্রদীপ বিবর রচনা করলেন। মিশেল ফুকোর 'আধুনিক' অবিন্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি এমন নিরালোক বলেই তাঁর উত্তর আধুনিকতার উত্তরণ নিষ্প্রতিভ না হতে পারে, কিন্তু শেষ বিচারে নিষ্প্রভ ও নিষ্ফল।

পাঁচ

অন্যদিকে হেবারমাস সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে এই পর্বের আধুনিকতার বিচার করেছেন। সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর বিচার প্রায় অবিকারী। আগেই বলেছি হেবারমাস আলোকপর্বীয় এবং আলোক-পর্ব-বাহিত আধুনিকতাকে কাম্য মনে করেন, তিনি তাঁর আধুনিকতাকে অধিষ্ঠিত করেন রেনেশাঁস ও এনলাইটমেন্টবিবর্ধিত যুক্তিনিষ্ঠায়, বিজ্ঞান-চেতনায় ও মানব সম্বন্ধীয় আস্তিক্যের প্রতি অঙ্গীকারে (এখানেই হেবারমাস মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মৌল মানবতন্ত্রী দর্শনের কেন্দ্রভূমি স্পর্শ করেছে। আধুনিকতার বিবেক-বুদ্ধিহীন, বিচারহীন, নীতিহীন, বিবর-প্রবেশ মানবেন্দ্রনাথের কাছে বিশ শতকীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভয়াবহ সঙ্কট বলেই মনে হয়েছিলো, তিনি আধুনিক মানুষের উত্তরণের রাস্তা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হচ্ছে।) ফুকো তাঁর পাগলামি ও সভ্যতা বইতে যে-কথাটা বলতে চান তা হল — পাগলামি মূলত জ্ঞানের একটা ধরন, স্বেচ্ছা-নির্বাসিত ব্যক্তির অদ্ভুত একটা জগৎই সৃষ্টির বাসনা। তাঁর 'পাগলামি' যুক্তি-যুগকেই চ্যালেঞ্জ করে বসল। তিনি বলেন, পাগলামি জ্ঞানের একটা রূপকল্প, যুক্তির উপরে অযুক্তির আধিপত্য। (ব্রাউন যেমন চেয়েছিলেন সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপরে প্রবৃত্তির আধিপত্য।) ফুকোর বক্তব্য বিচার-বিশ্লেষণ করলে যে সিদ্ধান্ত অনিবার্য, তা হল উন্মাদনা সিজোফ্রেনিয়া নয়, স্বাভাবিকতা আর সিজোফ্রেনিয়াগ্রস্তরা হল সত্যের জন্য সংগ্রামশীল।

এই ভাবনার সূত্রে ফুকো অতঃপর মার্কুস দ্য সাদ, নিৎসে এবং আর্তোকে যুগাবতার বলে ঘোষণা করেন। তিনি এও বলেন হোল্ডার্লিন ও নেরভালের সময় থেকে বহু পাগল লেখক, সংগীতকার, চিত্রকরের আবির্ভাব বাড়তে থাকে দিনে দিনে। এইসব ভাবুক এবং কবি-শিল্পীদের তিনি তাঁর 'পাগলামি'র সমর্থন খাড়া করলেন। এঁদের সৃষ্টির ভেতরেই তিনি পাগলামির বিকাশের লজিক খুঁজে পান। শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে, এই ফুকো-ব্রাউনের মতে, উত্তর আধুনিকতা সেই মেজাজ যা নিশ্চিহ্ন করে দেয় যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেকের সমস্ত বেড়ি, শিকল ও সীমা। এই মেজাজ মানে না সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিজ্ঞানাশ্রয়ী বিবর্তন, মানে না মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিবোধের ক্রমবিকাশ। আদিম, জৈব, দেহগত কিংবা উদ্দাম প্রবৃত্তির বাস্তবতার উপরে জোর আরোপ করতে গিয়ে ফুকোর পাগলামির দর্শন (যাকে উত্তর আধুনিকতার চূড়ান্ত রূপ বলে অনেকে মেনেছেন) স্বভাবতই ছিন্নভিন্ন করে দেয় শরীর এবং মনের, বুদ্ধি ও বিবেকের, চেতনা ও বিশ্বাসের, যুক্তি ও বিজ্ঞানের ব্যাকরণ।

শিল্প-সাহিত্যে এ দর্শনের প্রতীকী রূপান্তর অনেককে চমকিত করতে পারে, করেছেও। বিবর-সন্ধানী কিছু দুর্বল অসহায় জীবের মতো কিছু মানুষ-এর মধ্যে বিবরের আশ্রয় পেতে পারে, এ জগতে স্বেচ্ছানির্বাসনে ভাবতে পারে 'অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ' থাকবে। বিপদের সম্ভাবনা এখানে — এ জাতীয় উত্তর আধুনিকতা ধীরে ধীরে সমাজদর্শন ও জীবনদর্শনকেও আক্রান্ত করতে চাইছে। শুভ, সুন্দর জীবন ও সমাজের স্বপ্নে ফুকো-উদ্ভাবিত উত্তর আধুনিকতার আর কোনো বিশ্বাসই নেই, ফুকোর চোখে মানুষ হল একটা অল্পস্থায়ী কোনো ঐতিহাসিক আবির্ভাব মাত্র। বেলাভূমিতে পদরেখার মতোই, যাকে যে-কোনো সময় ঢেউ এসে মুছে দিতে পারে। মানুষের কোনো ভবিষ্যৎ নেই উজ্জ্বল পূর্ণতাও নেই। বিকাশধর্মী মনুষ্যত্ব বলে কোনো জিনিস নেই, দেরিদার মতো তিনিও বিশ্বাস করেন, অল্পস্থায়ী মানুষ ও 'কল্পিত' মনুষ্যত্বের 'ডিকনস্ট্রাকশন' (বিনির্মাণ) সম্ভব। আর এই বিবর-প্রবেশ কেবল পশ্চিমের জন্য সত্য নয়, এ আসলে সকল সভ্যতার শেষ পরিণাম। উত্তর আধুনিকতার একটা ধারার উল্টো ভাবনাচিন্তার এই নঞর্থক মীমাংসায় বিশ-একুশ শতকের নৈতিক সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের কোনো পথরেখা নেই বরং আছে অন্ধকারে কবর খোঁড়ার নির্দেশ।

ছয়

উত্তর আধুনিক ভাবনাচিন্তার নিয়ম-সংযম-নীতিহীন প্রবৃত্তি, সংস্কৃতি-সভ্যতা-প্রতিবাদী ও প্রতিস্পর্ধী নগ্ন বর্বরতা, মানুষ ও মনুষ্যত্বের ওপরে অবিশ্বাস ও অপমানের আঘাত, আদিম অন্ধকারে স্বেচ্ছা নির্বাসন, বিবর-প্রবেশ বাসনা, শব-সাধনা, বিনির্মাণ-চেতনা ও উন্মাদ-ক্রন্দনার ক্লিন্ন ধারাটির সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রবর্তিত ও বিশ্লেষিত মৌল মানবতন্ত্রের কোথায়ও কোনোও মিল নেই। অন্যদিকে রেনেশাঁস ও এনলাইটমেন্ট বাহিত আধুনিকতার ধারক ভাবুকেরা তাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান-মনস্কতায়, যুক্তিবুদ্ধির অবিরাম চর্চায় মানুষ ও মনুষ্যত্বের প্রতি অঙ্গীকারের চেতনাকে প্রসারিত করেছেন কালস্রোতের নিত্য নতুন মোহনার দিকে, ফ্রয়েডের ভাষায় — 'ক্রমান্বয়ে মহৎ ও মহত্তর সম্ভাবনার দ্বারোন্মোচন'-এর প্রত্যয় ও প্রত্যাশার অভিমুখে অথবা 'পোস্টমডার্ন র‍্যাশনালিজম্'-এর অধিশ্রয়ে জীবন-জিজ্ঞাসা ও সমাজ ভাবনার স্থির লক্ষ্যে। তাঁদের দৃষ্টিতে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বারোন্মোচনই উত্তর আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। এখানেই মৌল মানবতন্ত্রের সঙ্গে উত্তর আধুনিকতার এই দ্বিতীয় এবং অর্থবহ

ধারাটির আত্মীয়তা। এই আত্মীয়তা বিচারের আগে মৌল মানবতন্ত্রের ইতিহাস-বীক্ষণ ও দার্শনিক তত্ত্ব সংক্ষেপে বিচার্য।

সাত

মৌল মানবতন্ত্রের ইতিহাসচিন্তার মূল কথাটি হল মানুষের সার্বিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং অন্তরিত শক্তির বিকাশের বাসনাই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। মৌল মানবতন্ত্রের একটি প্রধান প্রতিপাদন — মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার, বিবর্ধন ও বিকাশের অদম্য কামনা। এই পৃথিবীর বুকে জন্মমুহূর্ত থেকেই মানুষ প্রথমে জৈব অস্তিত্বের তাগিদে প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করেছে। এ-ও স্বাধীনতারই সংগ্রাম। প্রতিকূলতার আধিপত্যকে আঘাত করে স্বাধীন হওয়ার সংগ্রাম। সে কখনও গুহার অন্ধকারে আত্মরক্ষার জন্য পালাতে চায় নি। সে বৃহৎ বিশ্বজগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, তাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা বুঝতে চেয়েছে, নতুন নতুন তথ্য ও সত্য আবিষ্কার করেছে, আর যতই সে বুঝেছে, জেনেছে ততই সে তার অন্তর্লীন শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এভাবেই মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে; জ্ঞানের আলো তাকে দিয়েছে আত্মপ্রত্যয় — স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার মূল এই আত্মপ্রত্যয়। সে শিখেছে, চেতনার মৃত্যুতে উন্মাদের মুক্তি সম্ভবপর কিন্তু মানুষের নয়, মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সংবেদী। মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি, দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় অনুশীলন ও সাধনার পিছনে আছে তার স্বাধীন আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রসারের প্রেরণা। সে এগোতেই চায়, বিবর- প্রবেশে তার সুখ নেই।

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর মৌল মানবতন্ত্রে মানুষকে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গরূপে বিচার করেছেন। নিশ্চেতন বিশ্বপ্রকৃতি থেকে ক্রম বিবর্তনের ধারায় এক সময়ে মানুষের মনোজগতেরও বিকাশ প্রক্রিয়ায় একটা জৈব-বিবর্তন ঘটেছে। জড় থেকে চেতনার জন্ম এবং এই দু-এর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকলেও পরিণামে চেতনা এক স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা অর্জন করেছে। মানুষের এই সচেতন সত্তাই তার কর্মোদ্যোগ, কর্মোদ্যম, তার সিসৃক্ষার — এক কথায় তার ইতিহাস, সংস্কৃতি, সভ্যতা গড়ার, অনুপ্রেরণার উৎস। এই ভাবনার সূত্রেই মানবেন্দ্রনাথ তাঁর মৌল মানবতন্ত্রে সভ্যতার ইতিহাসের মহত্তম দুটি ঘটনা — রেনেশাঁস ও এনলাইটমেন্ট প্রভাবিত ও বিবর্তিত মানুষ ও মনুষ্যত্বের মুক্তিকে সর্বাধিক মূল্য দিয়েছেন। মানুষের অন্তর্লীন শক্তির মহৎ সম্ভাবনাকে মৌল মানবতন্ত্র এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে যে, এই দর্শনে মানুষ ও মনুষ্যত্বের, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের, কর্ম ও চেতনার, বিশ্বাস ও যুক্তির, প্রবৃত্তি ও নীতিনিষ্ঠার বিচ্ছেদ দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত। মৌল মানবতন্ত্রের ইতিহাস-বীক্ষণে এ কথা বারবার বলা হয়েছে — রেনেশাঁসের প্রেরণার উৎস ছিল সচেতন সংবেদী মানুষের বিদ্রোহ। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে, অন্ধপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ মানুষের সার্বিক আত্মবিকাশ, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রগতিকে প্রতিহত করে বা করতে চায় এমন যে-কোনো অবস্থা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মৌল মানবতন্ত্র প্রকৃতির নিয়ম হিসেবে মানুষের মৃত্যুকে মানে (বিবরের অন্ধকারে অপমৃত্যুকে নয়), মনুষ্যত্বের মৃত্যুকে মানে না, নিশ্চেতন হয়ে জন্তু-জানোয়ারের মতো কোনো অরণ্যভূমির অন্ধকারে তার স্বেচ্ছানির্বাসনকেও যুগধর্ম বলে বিশ্বাস করে না। ইতিহাস, সমাজ ও সভ্যতার নায়ক যুক্তিবুদ্ধি-সম্পন্ন, নীতিনিষ্ঠ মানুষের কর্ম ও চিন্তাপ্রবাহ — মৌল মানবতন্ত্রের এই হল স্থির প্রত্যয়।

ঋণ স্বীকার ঃ "পুরোগামী"